ভাদুয়ার বাঘ

কাহিনীটা লোকমুখে শোনা। তবে ঘটনাটা ঘটেছিল যাদের নিয়ে সেই ঝণ্টিপিসি আর ফুলদিদি বলতে গেলে আমাদের আত্মীয়ই - রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও। ঝণ্টিপিসি পাটনায় মেছুয়াটুলিতে আমাদের বাসা-বাড়িতেই দেহ রেখে ছিলেন এ ঘটনার অল্প কিছুদিন বাদে। ফুলদিদি আগেই মারা গেছে। তার মৃত্যুকে ঘিরেই এই কাহিনীটা।

ঝণ্টিপিসি আমার বাবার গ্রাম সুবাদে পিসি। গান্ধিজী যেবার বিদেশী বর্জনের আহ্বান জানালেন এবং তার পরে পরেই যে সব মেধাবী, ভাল ভাল ডিগ্রীধারী ছেলে ছোকরারা --- অনেক বড়রাও --- শহরের সরকারী চাকরি বাকরির সুযোগ ছেড়ে গ্রামে গিয়ে ইস্কুল, ডিসপেন্সারি খুলে বসলো আমার ঠাকুর্দাও ছিলেন তাদের দলে। সেই প্রথম হাজারীবাগের কাছে একটা গণ্ডগ্রামে পত্তন তাঁদের। আমার বাবা কাকারা সেখানে ভূমিষ্ঠ হলেও আমরা ভাইবোনেরা কোনদিন যাইনি সেখানে।

ছোটবেলায় বাবা-কাকাদের মুখে সে গ্রামের গল্প কত যে শুনেছি! তাদের কথা শুনে মনে হ'ত ভাদুয়া যেন স্বপ্নরাজ্য। মাঠ-ঘাট-পুকুর-জঙ্গলে যত খুশি খেলা আর দৌরাত্মিপনা করেই কেটেছে তাঁদের জীবন। তার তুলনায় মেছুয়াটুলির ফ্ল্যাটখানা মনে হত খাঁচার মতন। নিজেদের নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি আর নিরাপত্তা ভরা জীবন যেন নীরবে ধিক্কার দিত। দূর থেকে ভাদুয়া হাতছানি দিয়ে ডাকতো আমায়। কিন্তু কোনদিনই আর সেখানে যাওয়া হয়ে উঠলো না আমার। হয়তো সে কারণেই ছেলেবেলাকার রোমাঞ্চ এখনও ঘিরে রেখেছে সেই গ্রামখানাকে। অন্তত আমার কল্পনালোকে ----।

ভাদুয়াতে না গেলেও সেখানকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি বহুদিন। আমার বাবা ডাক্তারী পাস করে পাটনায় প্র্যাকটিসে বসলেন। কাকারা দেশে গ্রামেই ছিলেন আরও অনেকদিন। তারপর এক এক করে তাঁরাও এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়লেন। ঠাকুর্দা ঠাকুরমা গত হয়েছিলেন আগেই। তবু ভাদুয়া থেকে বাবার পুরোনো বন্ধু-বান্ধব চেনা-পরিচিত কেউ না কেউ আসতোই মাঝে মাঝে। রাজধানী শহর। কাজ-কর্ম লেগেই থাকে কিছু না কিছু। আর, কার্যোপলক্ষে এত দূরে এসে প্রবাসে পড়ে থাকা গ্রামের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করে কি আর যেতে পারে কেউ? অন্তত গ্রামের লোক হলে? অতএব ভিটেমাটি ছাড়ার পরেও ভাদুয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে বহুদিন। যতদিন বাবা জীবিত ছিলেন।

ঝণ্টিপিসি আমাদের পাটনার বাসায় বার দুই এসেছিলেন। ফুলদিদিকে নিয়ে। কোন পুজো-পার্বন উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন সেই সুদূর হাজারীবাগ থেকে। আমরা তখন স্কুলে পড়ি। ফোর কি ফাইভে। আমার বয়স তখন বছর দশেক হ'বে। ঝণ্টিপিসি প্রথমবার আমার জন্যে সোনার মাকড়ি গড়িয়ে দিলেন মুখ দেখে। পরের বার হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টি এনেছিলেন। আর মার জন্যে শাড়ি। ঝণ্টিপিসিকে তখন খুব বুড়ি মনে হত। সেই গল্পের বইয়ের জটেবুড়ির মত। মা বলতেন, ঝণ্টিপিসির এমন কিছু বয়েস হয়নি। শোকে দুঃখে শরীর ভেঙে গেছে। তাইতেই অত বয়স মনে হয়। শোক তো হবেই, কম তো হারাননি জীবনে !

ঝণ্টি পিসেমশাই (তাঁর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না) নাকি হাজারীবাগ জেলার সেরা উকিল ছিলেন। সেই ভাদুয়া গাঁয়ে বসেই নাকি এমন পসার হয়েছিল যে ভিন গাঁয়ের জমিদাররা সব আসতো ওঁর মক্কেল হয়ে সলা-পরামর্শ নিতে। অস্টিনে চড়ে সারা দেশ চষে বেড়াতেন ঝণ্টিপিসে। ভাদুয়ায় ওঁদের বাড়িকেই রাজবাড়ি তুল্য মনে করতো সবাই। অত কাঁচা টাকা, সম্মান, প্রতিপত্তি আশে পাশের আরো দশটা গাঁ মিলিয়ে আর কারও ছিল না।

ফুলদিদি ওঁদের একমাত্র সন্তান। ছেলে হয়নি বলে ঝণ্টিপিসেকে আবার বিয়ে করতে পরামর্শ দিয়েছিল সবাই, কিন্তু পিসে তা করেননি। ফুলদিদি পরমা সুন্দরী ছিল। মা বলতেন ঝণ্টিপিসির কাছ থেকেই নাকি

অত রূপ পেয়েছিল ফুলদিদি। নইলে ঝণ্টিপিসে এমন কিছু সুপুরুষ ছিলেন না। কিন্তু ঝণ্টিপিসিকে দেখে সে কথা বিশ্বাস হতে চাইতো না। দু'ভাঁজ কুঁজো দেহটা, সারা শরীরের চামড়া ঝুল্ ঝুল্ করছে, দু'চোখে ছানি। পিসি কোনদিন রূপসী থেকে থাকলেও সে রূপের ছিটে ফোঁটা লক্ষণও ছিল না আর। ফুলদিদি ফুলের মতনই সুন্দর ছিল। কিন্তু সর্বদা দুঃখ দুঃখ মুখ করে থাকতো। কোনদিন হাসতে বা বেশী কথা বলতে দেখিনি।

মা বলতেন ওদের নাকি ভারী দুঃখের জীবন। দেখে শুনে মেয়ের জন্যে জামাই ঘরে এনেছিলেন পিসে। ভারী সুপুরুষ, সর্ব সুলক্ষণযুক্ত পুরুষ। উচ্চকুল, বিদ্যান। তবে তিন কুলে কেউ নেই --- ঠিক যেমনটি ওঁরা চেয়েছিলেন। ঘরজামাই করে বিষয় সম্পত্তি সব কিছু বুঝিয়ে হাতে তুলে দেবেন। অপুত্রক শ্বশুর শাশুড়ির পুত্রস্থান পূর্ণ করবে সেই বাসনা ছিল। কিন্তু কথায় বলে মানুষ ভাবে এক হয় আর। বিয়ের পর জামাই এসে ঘরে বসলো। কিছুতেই যেন অঙ্ক মেলে না। ঠিক কি যে বেমানান, কোথায় যে গলদ পরিষ্কার করে চোখে পড়ে না কারো। কিংবা চোখে পড়লেও সাহস করে বলতে পারে না কেউ। তাই কি?

অমন যে বাঘা উকিল ঝণ্টিপিসে, যার চোখকে কেউ কোনদিন ফাঁকি দিতে পারেনি এর আগে, বয়সের সঙ্গে কি তাঁরও এত বছরের শান দেওয়া বুদ্ধির ধার ভোঁতা হয়ে এসেছিল? নইলে এই বয়সে তেতলার চিলেকোঠা থেকে পা হড়কে পড়ার মত ভীমরতি কেন হবে তাঁর? তেতলায় উঠতেই বা যাবে কেন এই বয়সে, এতদিন পরে, এক তলাতে অফিসঘর আর বসবাস করে এসেছে বরাবর যে মানুষ? হার্টের ব্যামো আর ব্লাড প্রেশারের ভয়ে মোটা ফি দিয়ে শহরের সেরা ডাক্তারদের কাছে নিয়ম করে ফি হপ্তা ঘুরে আসছে যে লোকটা?

বাড়িতে উত্তেজিত আলোচনার খণ্ড অংশগুলো কানে আসে। ভাদুয়া থেকে লোকজন এসে আরও খবর শোনায়। আরও উত্তেজনা বাড়ে বাড়িতে। সে সব খবরে আমাদের ছোটদের অধিকার নেই। যদিও তখন আর এমন কিছু ছোট নই আমরা, বাবা-কাকারা অপ্রিয় আলোচনা থেকে তবু যথাসাধ্য সরিয়ে রাখেন আমাদের। মা-কাকীমারা আত্মবিস্মৃত হয়ে কখনো কিছু বলে ফেলেই আবার তক্ষুনি সামলে নেন। এই সব

খণ্ডিত তথ্যগুলো জুড়ে সাজিয়ে যেটুকু সংবাদ পাই তারই ভিতের উপর খাড়া এ কাহিনী। পাঠকদের সুবিধার জন্যে কল্পনার সিমেণ্ট লেপে অখণ্ডিত কাহিনীর রূপ দিতে চেষ্টা করেছি, তবে সিমেণ্টের তলার ভিৎটা কিন্তু নিরেট ইট পাথর অর্থাৎ সত্য দিয়ে গড়া। অন্তত আমার জ্ঞাতসারে। যদিও সে সত্য যাচাই করার সুযোগ হয়নি কোনদিন।

পর পর অতগুলো শোক পেয়েই ঝণ্টিপিসি অমন অকালে অথর্ব হয়ে গেলেন। স্বামীর মৃত্যু শুধু নয়, এক বিদ্‌ঘুটে নিদারুণ অপমৃত্যু। ভাসা ভাসা যে ভয়টা ওদের সংসারে অমূর্ত ছায়ার মত আনাচে কানাচে লুকিয়েছিল এতদিন, ঝণ্টিপিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিকটরূপে প্রকাশ্য হ'ল তা। রাতারাতি জামাই উধাও। সেই সঙ্গে আরও কত কি যে গেল তার হিসেব বাইরের লোকের আন্দাজসাপেক্ষ কেবল। ফুলদিদি এমনিতেই বড্ড চাপা, তাছাড়া ঝণ্টিপিসি তখন শোকে দুঃখে মুহ্যমান। মেয়েকে কাছে ডেকে কথা বার করার মত অবস্থা নয় তাঁর। তবু ফুলদিদির চেহারা দেখে লোকে বুঝে নিলো যে সিন্দুক ভেঙে নিয়ে যাওয়া জড়োয়া গয়না সোনা-দানার শোকে ফুলের মত মেয়েটা হঠাৎ এমন বিষন্ন, বজ্রাহত হয়ে যায়নি। গভীরতর কোনও অদৃশ্য ক্ষত, আরও নিদারুণ অব্যক্ত জ্বালা দিবানিশি রক্তাক্ত করছে, পুড়িয়ে মারছে তাকে।

ঝণ্টিপিসি ফুলদিদিকে নিয়ে দু'বার গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন পাটনায়। এসব কথা খোলাখুলি আলোচনা হয়নি তখন। সহানুভূতি, সমবেদনায় নীরবে ম্লান হয়ে থাকতো সবাই। পুরোনো ক্ষতটা নতুন করে রক্তক্ষরণ না করে যাতে তাই সে প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে যেতো লোকে। তবে ওরা চলে গেলে আলোচনা চলতো পুরোদমে। ঘরজামাই ওদের ঘর কতখানি উজাড় করে গেছে, ঝণ্টি পিসিমাদের বিরাট অট্টালিকার গুপ্ত কক্ষে আরও সোনাদানা আছে কি নেই, খুনে জামাই এতদিনে নিজেই বেঘোরে খুন হ'ল কিনা নাকি আবার খুনের নেশায় অকুস্থানে ফিরে আসবে - ঝণ্টিপিসি না হোক ফুলদিদির খোঁজে, এসব প্রসঙ্গ নিয়ে বহুদিন বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে আমাদের বাড়িতে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের কান বাঁচিয়ে। এ কাহিনীর ইতি কোথায় তা ভেবে কুল কিনারা পায়নি কেউ। অথচ কাহিনী নিজে নিজেই সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে বিধাতার অমোঘ নির্দেশে ----।

রোগে শোকে অকালবৃদ্ধা ঝণ্টিপিসি বয়সের সাথে সাথে আরও অথর্ব হয়ে গেলেন। চোখে ছানি পড়েছিল। কানেও ভাল একটা শুনতে

পেতেন না। আসলে মন বিকল হয়ে গেলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জবাব দিতে সময় লাগে না। মনের জোরই আসল জোর মানুষের। অযত্ন অবহেলায় সেই বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকার চুন বালি খসে আসছে। জায়গায় জায়গায় দেয়াল ফুঁড়ে গাছ গাছালি গজিয়েছে। কোথায় সে দাসদাসী, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ঝাড় লণ্ঠনের আলো। শূন্য পুরীতে মা আর মেয়ে যেন শ্মশান জাগছে। গ্রামের চেনা-জানারা একে একে চলে গেছে। বড় বুড়োদের অনেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। ছেলে-ছোকরারা চাকরি-বাকরির ধান্দায় এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'একজন যারা আছে তারাও নিজেদের ভাত-কাপড়ের ফিকিরে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করছে। আধপাগলাটে জটে বুড়ি আর তার পাষাণ প্রতিমা মেয়েকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তাদের।

তেতলা বাড়িতে শুধু মা আর মেয়ে। ঝণ্টিপিসি জরারুগ্ন দু'ভাঁজ শরীরটাকে কষ্টে টেনে নিয়ে এঘর ওঘর বারান্দা উঠোন ঘুরে ঘুরে ছানি পড়া চোখের অদেখা দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজে বেড়ান। ফুলদিদি নির্বাক নিস্তব্ধতায় রোজকার করণীয় কাজগুলো সেরে যায় যান্ত্রিক নিয়মে। ইদানীং তৃতীয় একটি প্রাণীর আমদানী হয়েছে। চতুষ্পদ জীবটিকে রেকাবিতে দুধ খাওয়াচ্ছিল ফুলদিদি।

ঝণ্টিপিসি সন্দিগ্ধ চোখে মাথা দুলিয়ে শুধোলেন, "হ্যাঁরে ফুলু, কিসের যেন সাড়া পাই ? ওটা কিরে?"

ফুলদি সংক্ষেপে জবাব দিলো, "কুকুর।"

এর পরেও মাঝে মাঝে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন ঝণ্টিপিসি, "হ্যাঁরে ফুলু, এ কুকুরটা কেমন? আওয়াজ শুনে বুকের মাঝে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে কেন?"

ফুলদিদি ঠাণ্ডা গলায় জানিয়েছে, "এটা বিলিতী কুকুর।"

এরপর তেতলার ঘরে চলে গেছে প্রাণীটা। ঝণ্টিপিসির ধারে কাছে আসেনি আর। অবশ্য প্রাণীটার কুশলপ্রশ্ন মাঝে মাঝেই করেছেন ঝণ্টিপিসি। শুনেছেন বাঘা - প্রাণীটার তাই নাম নাকি - ভালো আছে।

বাড়ির চারিদিকে আগাছার জঙ্গল, দু'একখানা ঘর ছাড়া বাকি সব ঘরগুলো কতবছর অব্যবহৃত পরিত্যক্ত পড়ে আছে। বাড়ির ইতিহাসে

জড়িয়ে গেছে অপমৃত্যু, অপযশের ছায়া। নিশুতি রাতে বিকট একটা অপার্থিব আওয়াজ শোনা যায় মাঝে মাঝে। যেন কোন অশরীরী আত্মা প্রতিশোধের তৃষায় ছটফট করে ছুটে বেড়াচ্ছে শূন্য অট্টালিকার নির্জন প্রাকারে। গ্রামের লোকেদের বুক কেঁপে ওঠে নিশীথ রাতের সে হুঙ্কারে। দিনের বেলাতেও ভূতুড়ে বাড়িটাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে সবাই।

শীত যায়, বসন্ত আসে। বসন্তের পর গ্রীষ্মের খরা রোদ। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। গেরুয়া ঝরা পাতা যেন মাঠে মাঠে আগুন ছড়িয়ে দেয়। শুধু গ্রামে নয়, সারা দেশে যেন আগুন লেগেছে। আনাজ-তেল-পরনের কাপড়, হু-হু করে দাম বাড়ছে সব কিছুর। নাগালের মধ্যে পায় সে সাধ্য কোথায় সাধারণ মানুষের ! পেটে আগুন, মাথায় আগুন। সংসারে সংসারে আগুন। ঋতু বদলায়। শীত আসে। বসন্ত আসে। আগুন আর নেভে না। মনের আগুন। পেটের আগুন। মাথার আগুন।

ঝণ্টিপিসির জামাইয়ের নাম শিবতোষ। ফুলদিদির বর। ভোরবেলা দু'ভাঁজ শরীরটাকে কষ্টে টেনে টেনে উঠোনে নেমে অদেখা চোখে আঁতি পাঁতি করে এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে রোজকার মত কি যেন খুঁজছিলেন পিসি।

পায়ের উপর উপুড় হয়ে কেউ প্রণাম করায় হকচকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কে?"

"আমি শিবতোষ।"

দীর্ঘ আট বছরের ব্যবধান। শোক জ্বর-জারির উপর আটটা বছরের ধুলো বালির ভার পড়েছে। শুধু দেহে নয়, মনেও। স্মৃতি পটেও। ঝণ্টিপিসি হয়তো সময়োপযুক্ত কিছু বক্তব্য খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন কিংবা অতীতের অনেকগুলো ঘটনা একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভেসে ওঠায় ঘটনা পরম্পরার হিসেব রাখতে না পেরে খেই হারিয়ে ফেলেছিল ঝণ্টিপিসির শোকাহত দুর্বল মস্তিষ্ক।

এমন সময় শুনলেন ফুলদিদি ঠাণ্ডা গলায় বলছে "এসো।"

আগন্তুককে। জামাই শিবতোষকে।

শিবতোষ এই সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তার এই হঠাৎ আগমনের সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ৎ তৈরী করে এনেছিল কি না এবং কৈফিয়তের প্রয়োজন না হওয়ায় সে খুশি হ'ল কি হতাশ হ'ল,

ফুলদিদির নিরুত্তাপ নিরুৎসুক অভ্যর্থনাকেই বা সে কি ভাবে গ্রহণ করলো সে খবর ঝণ্টিপিসির জানার কথা নয়। হয়তো এ সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায়নি শিবতোষ। কারণ তার মাথায় অন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার ঘুরছিল তখন। যাই হোক শিবতোষের আগমন কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি গ্রামে। বলতে কি গ্রামের লোকেরা জানতেই পারেনি ব্যাপারটা। পারতপক্ষে ও পথে যাতায়াত করতো না কেউ ইদানীং। বিশেষত রাতবিরেতে সেই বুক কাঁপানো আওয়াজটার সূত্রপাতের পর।

শিবতোষের আগমনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল। ঝানু উকীল শ্বশুরকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। ঝণ্টিপিসে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছিলেন শিবতোষকে। ঠিক বিয়ের পরে পরেই। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। বড় আদরের মেয়ে তাঁর। সে মেয়ের সোহাগ, আনন্দ মুছে যাক সে চিন্তাও সহ্যাতীত ছিল তাঁর। তাই নিজের মনকে বুঝিয়েছিলেন যে এ তাঁরই বোঝার ভুল। কিন্তু তাঁর সে সংশয় টিকলো না বেশীদিন। পাষণ্ড শিবতোষকে নবপরিণীতা ফুলের মত কমনীয় বউয়ের আকর্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি হাতের কাছে যা পেলো হাতিয়ে পালালো। শ্বশুরের বর্তমানে সম্ভব হ'ত না ব্যাপারটা। তাই পথের কাঁটা শ্বশুরকে সরিয়ে দিয়ে কাজ সেরে কেটে পড়লো রাতারাতি। কিন্তু দুশ্চরিত্র শিবতোষের হাতে সে টাকা খোলামকুচির মত উড়ে গেল। ক'বছরে সব বেচেবুচে উদরস্থ করে আবার নতুন ফন্দি ফিকিরে ঘুরতে লাগলো।

এই আট বছরে বহু ঘাটের জল খেয়েছে সে। তলে তলে খোঁজ খবরও নিয়েছে সব। শ্বশুরের ভিটে কামড়ে পড়ে আছে বুড়ি আর বুড়ির মেয়ে। বুড়ি চোখে দেখে না, কানে শোনে না। মেয়ে অবশ্য সবল সতেজ জোয়ান, কিন্তু সে তো তারই বউ। যে ক'দিন ঘর করেছে বউ নিয়ে তাতেই টের পেয়েছে শিবতোষ যে তার সুঠাম শরীর আর চৌকস আদব-কায়দা দেখে বউয়ের তার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে বশ করার বিদ্যে ভালই রপ্ত আছে শিবতোষের, সেই কোন বয়স থেকে আরম্ভ করে এ যাবৎ এনতার মেয়ে খেলিয়েছে সে। মেয়ে খেলানো ছেলেখেলা শিবতোষের কাছে। মেয়েমানুষ হ'ল মোম। দূর থেকে দেখে মনে হয় ঠাণ্ডা যেন শ্বেতপাথর। সব বুজরুকি। একটুখানি কাছে হও, একটু গরম কর দিকি ! গরম হলেই মোম টপ্‌টপ্‌ করে গলে গলে পড়বে।

মেয়েদের গরম করার কায়দা শিবতোষকে শেখাতে লাগে না। সে বিদ্যেতে হাত পাকা হয়ে গেছে তার। সেই কবে থেকে।

আসল খবর যা জোগাড় করেছে শিবতোষ তা এই। দেশজুড়ে এত অভাব এত অনটন। উকীল বাড়িতে মা আর মেয়ের অর্থাভাব নেই কোনও। পাগলী মা আর উদাসীন মেয়ে জঙ্গলপুরীতে শ্মশান জাগছে বটে কিন্তু এ পর্যন্ত হাতটান করতে হয়নি তাদের। শিবতোষের নিজের বড়ই দুরাবস্থা যাচ্ছে তখন। হাতে কাঁচা টাকা নেই। অভাব অনটনে পড়ে দেশের মানুষজন বড় সেয়ানা হয়ে গেছে। ফট করে ঠকে না আর যার তার কাছে। ঠগ-জোচ্চুরির ধান্দায় বড়ই আকাল যাচ্ছে ইদানীং। অথচ শিবতোষের মত লোকের স্বভাব চরিত্রের গঠনই এমন যে মুঠো মুঠো কাঁচা টাকা তাদের চাইই। যে কোন উপায়ে। অতএব শেষ পর্যন্ত আট বছর আগের ফেলে আসা নতুন বউয়ের কাছে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলো শিবতোষ। অন্তত সাময়িক ভাবে। পুরোপুরি কাজ সারা অবধি।

তবে মনের মাঝে একটা অস্বস্তির কাঁটা গেঁথে ছিল। শ্বশুরের মৃত্যুটাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছে মেয়েটা, এ ব্যাপারে তার নিজের ভূমিকা পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে কতখানি ঝুঁকি হতে পারে তার দরুন, সে সম্বন্ধে একটু দুশ্চিন্তা ছিল তার। ফুলমণির নিরুত্তেজ ব্যবহারে শিবতোষ স্বস্তি পেলো। মনে মনে বললো বোকা মেয়েটা অভিমান করেছে। মেয়েমানুষের অভিমান ভাঙতে দেরী লাগে না। কায়দা জানা চাই।

এরপর কতদিন কাটলো তার হিসেব পাওয়া যায়নি আর। এমনিতেই থুত্থুরি বুড়ি ঝণ্টিপিসি, সময়ের খেই হারিয়ে যায়। জামাই ফিরে আসা অবধি যেন আরও বেশী জট পাকিয়ে গেছে সব কিছু। মেয়ের চটুল-চপল কাটাকাটা কথা, অট্টরোল হাসি, ষোড়শোপচারে রান্নাবান্নার সমারোহে তাক লেগে যায় ঝণ্টিপিসির। অতীত বর্তমান সব মিলে মিশে একাকার হয়ে তাণ্ডব তোলে দুর্বল মস্তিষ্ক জুড়ে। এলোমেলো গোলমাল হয়ে যায় সব। এরপর ঝণ্টিপিসি কিছুতেই সঠিক বলতে পারেন না, কতদিন গেল - সে কি যুগ না মুহূর্ত না অনন্তকাল -।

শিবতোষ শিষ্ দিয়ে কি একটা সুর ভাঁজছিল।

ফুলমণি আদুরে গলায় বললো, "ওমা, শুনছো তোমার জামাইয়ের কথা? এখানকার ভিটে তুলে আমাদের নিয়ে ডাল্টনগঞ্জ যাবে। সেখানে বাড়ি করবে বলছে ----।"

ডাল্টনগঞ্জের বাড়ির ছক কেটে তাই নিয়ে কত বাদ বিবাদ মেয়ে জামাইয়ে।

মেয়ে বলে, "ওমা তিন কামরার বাড়ি কি গো ! দোতলা না তুললে যাচ্ছি না আমি। তুমি তো বাপু নিজের ব্যবসাপত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে সারাদিন। আমার দিন কাটবে কি করে বলো তো? দোতলার ঝুল বারান্দায় বসে শীতের দিনে উল কাঁটা দিয়ে সোয়েটার বুনবো, গরম কালে সেলাইপত্তর করবো। ঝুল বারান্দা আমার চাইই। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। মা'র কাছে এখনও যা আছে তা দিয়ে একটা ছেড়ে তিনটে বাড়ি তুলতে পারো তুমি।"

ডাল্টনগঞ্জ যাবার দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। ওঁদের নয়, জামাইয়ের। জামাই টাকা নিয়ে যাবে। দোতলা বাড়ির জন্যে জমি কিনবে, ভিত তুলবে। সেই বাড়ি তৈরী হ'লে তবে গিয়ে এরা যাবে।

ফুলমনি বলে, "তুমি বাপু সিমেণ্ট চুরি যাবে বলে ছ'মাস বাড়ি আগলে বসে থেকো না। মাসে একবার অন্তত আসা চাই এখানে। একটা চৌকিদার বসিয়ো দেখাশোনা করার জন্যে। কতই বা মাইনে চৌকিদারের ! তোমায় অতো কিপ্টেমী করতে হবে না। মায়ের হাতে এখনও সোনাদানা নগদ টাকা যা আছে তাতে একটা ছেড়ে চৌকিদারের ফৌজ পুষতে পারো মাসের পর মাস ----।"

মেয়ের কথাবার্তা ভাল বুঝতে পারেন না ঝণ্টিপিসি। কেমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হয়। ভয়ে কিছু বলতে পারেন না। কিছু বলতে গেলেই তো তাবড়ানি দিয়ে চুপ করিয়ে দেবে মেয়ে। তারপর মায়ের নির্বুদ্ধিতা নিয়েই কত ঠাট্টা মস্করা করবে জামাইয়ের সঙ্গে। মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। মেয়েটার ভীমরতি ধরতে বাকি নেই। না হয় বর ফিরে এসেছে, এতকাল পরে সোহাগী হয়েছিস আবার। তাই বলে এত? মেয়ের কথাবার্তা পাগলের প্রলাপ বলে মনে হয় ঝণ্টিপিসির। তেতলার দেয়ালে গুপ্ত কুঠুরী, তাতে খোপভর্তি শুধুই মহারাণীর আমলের গিনি আর দামী দামী

পাথর সব। কই, এতকাল রয়েছেন এ বাড়িতে, ঝণ্টিপিসি তো কস্মিনকালে শোনেননি এ সব? সোহাগী মেয়েটা পুরোপুরি পাগলই হয়ে গেল বুঝি ----।

পরদিন শিবতোষ চলে যাবে ডাল্টনগঞ্জ। নতুন বাড়ির ব্যবস্থা করতে। সকালে শুধু চা বানালো ফুলদি। ঝণ্টিপিসিকে এক গ্লাস চা ধরিয়ে দিয়ে বললো, "মা, খিদে পেলে ঘরে ফল রাখা আছে খেও। দুধ জ্বাল দিয়ে রেখেছি। আমরা উপরে যাচ্ছি। আজ রান্নার দেরী হবে।"

ঝণ্টিপিসি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি পরের ঘটনাগুলো। তবু ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলেন। ওরা উপরে কেন যাচ্ছে ঝণ্টিপিসি জানেন। উপরে মানে তেতলায়। সেখানে গুপ্ত কুঠুরির খোপ থেকে হীরে পান্না আর মহারাণীর আমলের সোনার গিনি বার করে জামাইয়ের হাতে দেবে মেয়ে। সেই রকমই কথা হয়েছে দু'জনের। নিজের কানে শুনেছেন ঝণ্টিপিসি। কোথায় সোনার গিনি, কোথায় বা হীরে ! জামাই আবার চটে মটে না যায়। ওদের পায়ের শব্দ পান সিঁড়িতে। জোরে জোরে কথা বলছে মেয়ে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

ঝণ্টিপিসি আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির কাছে এসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কতক্ষণ চুপচাপ। কোন শব্দ কানে আসে না আর। ঝণ্টিপিসির কানের জোর কম। মনোযোগ দিয়ে না শুনলে কানে খুব একটা শোনেন না তেমন। একাগ্র মনোযোগ দিয়েও কিছু শুনতে পেলেন না কিছুক্ষণ। কতক্ষণ কে জানে? মুহূর্ত আর যুগ আর অনন্তকাল মিলে একাকার হয়ে যায় ঝণ্টিপিসির দিশেহারা মনে। তারপর হঠাৎ নিস্তব্ধতার বুক চিরে অপার্থিব গর্জন ও আর্তনাদে ভরে যায় আকাশ বাতাস। একি মানুষের কণ্ঠ? না পশুর? না প্রেতাত্মার? সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার আপ্রাণ ব্যর্থ চেষ্টায় ঝণ্টিপিসির শরীর ঘেমে ওঠে। পরমুহূর্তে আবার হিম হয়ে যায় নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। "ফুলু ----", আকুল কণ্ঠে মেয়ের নাম ধরে একবার চিৎকার করে ডেকে ওঠেন ঝণ্টিপিসি। তারপর সমস্ত চেতনা লোপ পেয়ে যায়।

গ্রামেরই কেউ খবর পাঠিয়েছিল বাবাকে। বাবা গিয়ে ক'দিন পরে ঝণ্টিপিসিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। বাবা ডাক্তার। বুঝতে পেরেছিলেন ঝণ্টিপিসির আর বেশীদিন নেই। শেষের ক'টা দিন অন্তত একটু

দেখাশোনা যত্ন পাবেন আমাদের বাড়িতে। রক্তের সম্পর্ক না হ'লেও গ্রাম সুবাদে পিসি তো! গ্রামে তো এখন আর কেউই তেমন চেনা জানা নেই পিসির। সে তুলনায় আমরাই পরমাত্মীয়। দিন দশ বেঁচে ছিলেন ঝণ্টিপিসি। ওষুধ দিয়ে মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হ'ত। জ্ঞান হ'লে অনর্গল কথা বলে যেতেন। মনে হ'ল শেষের দিকে রোগ-শোক-জরার ভার নেমে গেছে তাঁর চেতনা থেকে। এতদিন মনের মধ্যে যে জটগুলো পাকিয়েছিল সেগুলো খুলে ঘটনা পরম্পরা মনের মধ্যে সাজিয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার সহজবোধ্য করে তুলতে চাইছেন নিজের কাছে। শুধু একটা কথায় ধাঁধাঁ লাগতো। ঝণ্টিপিসি বারে বারে তর্কের সুরে বলতেন, "তোমরা বলছো ফুলুকে জামাই ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তারপর জামাইকে বাঘে খেয়েছে। আমি তো আগে জামাইয়ের চিৎকার শুনলাম। সেই সঙ্গে বাঘার। সে কি বিকট আওয়াজ বিলিতী কুকুরের ! সে সব থেমে গেল। তারপর ফুলুর চিৎকার। আর কিচ্ছু জানিনে ----।"

ঝণ্টিপিসি ঘুমের মধ্যে মারা গেলেন। বাবার কাছে শুনলাম ওঁদের বাড়িতে একটা বাঘ পাওয়া গেছে। বেশ বড়সড় জোয়ান বাঘ। হাজারীবাগ অঞ্চলে বনে জঙ্গলে বাঘ দেখতে পাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। ঝণ্টিপিসিদের বাড়ির প্রকাণ্ড কাম্পাউণ্ড জুড়ে আগাছা জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। কখন কোন সময় বাঘটা ওখানে আড্ডা গেড়েছে কেউ বলতে পারেনি। তবে তেতলা অবধি গতিবিধি ছিল যে বাঘের, সে যে এতকাল একটা নড়বড়ে বুড়ি আর অল্পবয়সী একটা মেয়েলোককে একবারও আক্রমণ করেনি তা প্রায় অলৌকিক রকমের সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে সবাই। কারণ সেই বাঘই শিবতোষের ভবলীলা সাঙ্গ করেছিল এমন নৃশংসভাবে যে শেষকৃত্যের জন্য মাংসপিণ্ডগুলো জড়ো করতে বেশ মেহনৎ হয়েছে গ্রামের লোকেদের। শেষ পর্যন্ত বাঘটা চিড়িয়াখানায় চালান করে দেওয়া হয়, কারণ একবার নরভক্ষী হয়ে গেলে সে বাঘ আর শোধরায় না। তবে ভাদুয়ার লোকেদের মুখে শুনেছি গ্রামের লোকেরা এর পরও নাকি নিশুতি রাতে সেই অপার্থিব গর্জন শুনে এসেছে বরাবর। ঠিক আগের মত।